Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-I, October 2024, Page No.60-67
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান

অনন্যা নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Acharya Prafulla Chandra Roy (1861–1944) was a pioneering Indian chemist, educator, and thinker whose contributions extend beyond science into the realm of education and national development. His educational philosophy is deeply intertwined with his belief in self-reliance, national pride, and the empowerment of the individual through practical and holistic education.

Prafulla Chandra Roy was a strong advocate of science education, especially in colonial Bengal, where he sought to inspire a new generation of students to take pride in India's intellectual traditions while embracing modern scientific advancements.
He argued that teaching science and technical subjects in the mother tongue would make them more accessible to the masses and break the elitist barriers imposed by colonial education systems. He was also a supporter of vocational education, emphasizing the need for practical skills that could directly contribute to the economic and industrial development of India. His view was that education must cultivate moral responsibility.

Acharya Prafulla Chandra Roy's philosophy was part of a broader nationalist movement that sought to decolonize education. His focus on science and technical education as a means for national regeneration. His educational ideals laid the foundation for subsequent developments in India's educational policies, especially in the fields of science and technology.

This research article explores that Acharya Prafulla Chandra Roy's educational philosophy, rooted in the integration of scientific, ethical, and practical learning, offers valuable insights into the role of education in personal and national development. His vision of an education system that promotes self-reliance, moral responsibility, and social consciousness continues to be relevant in today's educational discourse.

Keywords: Educational philosophy, Science education, Indian chemist, National development, Self-reliance.

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বহুবর্ণময় জীবন বিস্ময়কর, তবে বাঙালি জাতির কাছে তিনি বিশেষ রূপে 'আচার্য' নামে পরিচিত। ভারতের রসায়নবিদ্যার অন্যতম পুরোধা তিনি, বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তি স্থাপনে তাঁর অবদান

অবিস্মরণীয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং নিজে ছিলেন অসম্ভব অধ্যাবসায়ী। তাঁর গবেষণা ও কর্মক্ষেত্রের ব্যাপ্তিও বিশাল। তাঁর শিক্ষাচিন্তা হল এই দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের ফলশ্রুতি এবং অধ্যাবসায়ের নির্যাস।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তৎকালীন বাংলাদেশের যশোর জেলার রাড়ুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হরিশচন্দ্র রায়, মাতা হলেন ভুবন মোহিনী দেবী। হরিশচন্দ্র রায় ছিলেন জমিদার, তিনি নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আরবী এবং ফারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। শিক্ষা অনুরাগী হরিশচন্দ্র রায় নিজের বাড়িতে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ১৮৫০ সালে নিজ গ্রামে ভুবনমোহিনী দেবীর নামে একটি গার্লস স্কুল ও সকলের জন্য একটি মিডল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ সালে হরিশচন্দ্র রায় সপরিবারে কলকাতায় স্থানান্তরিত হন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলকাতায় এসে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে তিনি লেখাপড়ায় ভালো। গিলক্রিস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস সি পাস করেন। ১৮৮৭ সালে ডি. এস সি ডিগ্রি পান। তিনি 'হোপ স্কলার্শিপ'ও পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালীন সামাজিক আন্দোলন, শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তার কর্মকাণ্ড ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নানান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্যচর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহসভাপতি রূপে- ন'বার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৩৩৮ থেকে ১৩৪১ পর্যন্ত চার বছর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হন।১৯১০ সালে রাজশাহীতে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বিজ্ঞান শাখা সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯১৩ এবং ১৯১৪ সালে। অ্যালবার্ট হলে ১৯২৯ সালে কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হয় এই সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচিত প্রবন্ধগুলিতে বাঙালি জাতি তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলি তাঁর জীবন দর্শন, চিন্তাভাবনার সাথে সাথে তাঁর সাহিত্যিক বোধেরও পরিচয় বহন করে। ১৩১৯ সালে প্রবাসী পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় তিনি লেখেন 'একটি স্বদেশী কারখানা' নামক প্রবন্ধ। 'বাঙালি কোথায়?' নামক তার বিখ্যাত প্রবন্ধটি ১৩৪৬ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ হল 'চরক ও সুশ্রুত সময় নিরূপণ' বঙ্গীয় পরিষদ পত্রিকায় ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়, এটি প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নবকান্ত কবিভূষণ দ্বারা রচিত। সামাজিক নানা বিষয়ের সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' ১৯১০ সালে 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অন্নসমস্যা ও বাঙালির নিশ্চেষ্টতা' (মাসিক 'বসুমতী', ফাল্গুন, ১৩২৯) 'বাঙালি কোথায় গেল?' ('প্রবাসী', ১৩৩৯) 'বাঙালির শক্তিসামর্থের অপব্যবহার ও বর্তমান সমস্যা' (মাসিক 'বসুমতী', আষাঢ়, ১৩৩১) 'কৃষি, ব্যবসা ও বাঙালি যুবকের অন্নসমস্যা' ('ভারতবর্ষ', চৈত্র, ১৩৩৫)। 'শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি কথা' (১৯১৭) 'শিক্ষা ও সেবা' (১৯২১) 'বাংলা ভাষায় নতুন গবেষণা' (১৯২২)' ডিগ্রির অভিশাপ' (১৯২৬) শিক্ষা বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অধ্যায়ন ও জ্ঞানলাভ'। এছাড়াও বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীও অনুলিখিত হয়েছে।

তাঁর শিক্ষা দর্শন ছিল বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। শিক্ষা লাভের ফলে ছাত্ররা চরিত্রবান, জ্ঞানবান ও কর্মবীর হয়ে উঠবে এটাই তিনি আশা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিকতা, সুস্থ শরীর, কর্মদক্ষতার মতন বিষয়গুলিও তাঁর ভাবনায় অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। উন্নত শিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থাকার ফলে, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার পরিকাঠামো সম্বন্ধে তিনি সুপরিচিত। শিক্ষকতার পেশায় বেতনের সমস্যাকে তিনি উপযুক্ত শিক্ষাদানের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষকদের উপার্জনের জন্য অন্য ব্যবস্থায় নিযুক্ত হতে হয়, যার ফলে শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিসর পাওয়া যায় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজে প্রথমে আড়াইশো টাকার মাইনেতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই মাইনেয় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ক্রাফট্ সাহেবের কাছে এই বিষয়ে আবেদন করেও কাজ হয়নি।

আর্থিক সমস্যা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা এটা তিনি খুবই ভালোভাবে জানতেন। শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে তিনি নিজে ছিলেন মুক্ত হস্ত। শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি ১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দশহাজার টাকা দান করেন। অধ্যাপক হিসেবে তিনি বিজ্ঞান মন্দিরে কর্মরত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কর্মক্ষেত্রে পাঁচ বছরের জন্য আবার নিযুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডাকে সাড়া দেন কিন্তু অধ্যাপক রূপে সাম্মানিক এক হাজার টাকা তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি বলেন ওই টাকা বিজ্ঞান মন্দিরের রসায়নিক বিভাগের উন্নতিকল্পে ব্যবহার করার জন্য।এছাড়াও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বজ্রলাল কলেজ, খুলনা কলেজ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কলেজ, বাগেরহাট কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ দান করেছেন। হাসপাতাল, রাস্তা নির্মাণ, সমবায় প্রতিষ্ঠার মত জনকল্যাণমূলক কাজেও তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

শিক্ষকের নৈতিকতা ও চারিত্রিক গুণের দৃষ্টান্ত তিনি নিজে। তৎকালীন উপনিবেশিক শাসনের অধীনে দেশের শিক্ষার পরিকাঠামো যথেষ্ট ছিল না। যেটুকু অর্থ বরাদ্দ হত তাতে শিক্ষার জন্য প্রকৃত অর্থ বরাদ্দের তুলনায় মাথা ভারী প্রশাসনিক কাজগুলি বেশি গুরুত্ব লাভ করত। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নতি, শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি বা শিক্ষকের মাইনে বৃদ্ধির তুলনায় ইংরেজ সরকার ইন্সপেক্টরের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজে বেশি অর্থ ব্যয় করত।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত নানা সমস্যার ফলে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির দিকটি অবহেলিত থেকে যেত। প্রকৃত রূপে শিক্ষিত হতে হলে ছাত্রদের কেবল মাত্র পুথিগত বিদ্যায় আবদ্ধ থাকলে হবে না, তিনি বলছেন -

> "ডিগ্রির প্রতি অত্যাধিক আসক্তি আজকাল যত অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে"[i]

মুখস্ত বিদ্যাকে অবলম্বন করে ছাত্ররা কেবল চাকরিজীবী হবে এই গড্ডালিকা প্রবাহকে তিনি অস্বীকার করেছেন। ডিগ্রির মোহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

> ''আমাদের মৃতকল্প স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণ কেবলমাত্র একজামিনের পর একজামিন পাস করিয়া যাইতেছে - বাস্তবে একজামিন পাস করিবার নিমিত্ত এমন হাস্যদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাস করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ - শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিও আর কোন দেশে নাই।''[ii]

সাধারণত বাঙালি পরিবারে সকলে চায় সন্তান বেশি পড়াশোনা শিখুক। তার কারণ হল উচ্চশিক্ষা সহজে উচ্চমাইনের চাকরি সুনিশ্চিত করে। এই উচ্চমাইনের চাকরির জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কদর। প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষালাভ ও অর্থ উপার্জনের এই বিষয়টিকে এত বেশি সমানুপাতিক হিসেবে দেখতে নারাজ। তিনি বলেন-

> "নৈতিকতা ও মানসিক উন্নতি সাধনই যে শিক্ষার মুখ্য উদ্দ্যেশ্য এ কথা ভুলিলে চলিবে না।... উচ্চশিক্ষাকে অর্থপার্জনের একমাত্র উপায় স্থির করিলে চলিবে না।"[iii]

জীবিকা অর্জনের জন্য বাঙালির অত্যাধিক চাকরিমুখী মানসিকতা জাতির পক্ষে শুভ নয় বলে তিনি মনে করেছেন।

ব্যবসার প্রতি তিনি বরাবর আগ্রহী ছিলেন। বাঙালির বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যকে সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দারিদ্রতা দূরীকরণেও ব্যবসার প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখা যায়। ১৯০১ সালে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল গঠন করেন, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বাঙালি জাতির চাকরি মুগ্ধতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-

> "উচ্চশিক্ষার অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়াও ২০/২৫ টাকার কেরানি বৃত্তিতে জীবনযাপন বাঙালি যুবকের চরম পুরষ্কার"[iv]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নীরস মুখস্ত বিদ্যার পক্ষপাতী তিনি নন। তিনি মনে করেন একজন মানুষের বিচার বুদ্ধি বিদ্যালয়ের পাঠ্য কয়েকটি মাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি বলেছেন -

'প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া আসিলাম। তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল, কিন্তু গ্রহণের দিন যেই ঘরে ঘরে শঙ্খঘন্টা বাজিয়া উঠে এবং খোল-করতালের সহযোগে দলে দলে কীর্তনীয়রা রাস্তায় মিছিল বাহির করে, অমনি সেই সকল সত্যের পূজারীরাও সকল শিক্ষাদীক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া দলে দলে ভিড়িতে আরম্ভ করে এবং ঘরে ঘরে অশৌচান্তের মতো হাঁড়িকুড়ি ফেলার ধুম লাগিয়া যায়।'

যে ছাত্রের যে বিষয়ে আগ্রহ আছে তাকে সেই বিষয়ে উৎসাহী করতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন ছাত্র ইতিহাস পছন্দ করে তাকে জোর করে অঙ্কে পারদর্শী করতে গেলে হবে না। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যে বিষয়ে আগ্রহী হয় সেই বিষয়ে সে ভালো ফল করতে পারবে। তিনি যখন ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মনে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা। এই কারণে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস নিতেন, কীভাবে রাসায়নিক বিদ্যায় নতুন আবিষ্কার হয় তা ছাত্রদের বলতেন, যা তাদেরকে রসায়নশাস্ত্রে আগ্রহী করে তুলবে। পরীক্ষায় পাস করা এবং পাঠ্য পুস্তকের বাইরেও যে রসায়ন বিদ্যার বিস্তার এই মনোভাব তাঁর শিক্ষকতার মধ্য ছিল। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি, গুরুত্ব আরোপ করা তার শিক্ষা দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী। তিনি চাইতেন মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে এই শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রদের ক্লাস নেবার সময় প্রায় তিনি বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন, যেমন- বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রদের জন্য 'প্রাণী- বিজ্ঞান'। তিনি মনে করেছেন সমগ্র জাতির কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হলে মাতৃভাষাকে প্রধান্য দিতে হবে।

১৯০৬ সালের ১১ মার্চ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। পরবর্তী সময় তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার বেশি করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে সফল হবে । সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার মতো বিষয়গুলি বিজ্ঞানমনস্কতার দ্বারাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর তার জন্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপনার সাথে যুক্ত প্রবাদপ্রতিম এই শিক্ষক ভারতের বিজ্ঞান সাধনারও অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি বলেন -

> ‘‘বাংলা সর্বত্র প্রকৃতির অজস্র দান ছড়াইয়া আছে,তাহাকে কি রূপে শিল্পের উৎপাদনের রূপে ব্যবহার করা যায়?’’ [v]

১৮৯৫ সালে তিনি মারকিউলাস নাইট্রাইট (Mercurous Nitrite) আবিষ্কার করেন। তাঁর তীক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বারা নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা সফল ভাবে সংঘটিত হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল ‘A History of Hindu Chemistry’ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত ১৯০৭ সালে। প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিদ্যচর্চা সম্পর্কিত গ্রন্থ এটি। দীর্ঘ পনেরো বছর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেষণা ও অধ্যাবসায়ের ফল এই গ্রন্থ । এই গ্রন্থটি ‘হিন্দু রসায়নী বিদ্যা’ নামে বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয় ১৩৫০ সালে। এই গ্রন্থ তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। ১৯০৬ সালে ‘নব্য রাসায়নিক বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি’ নামক বইটি প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩১৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় ‘রাসায়নিক পরিভাষা’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।এই গ্রন্থের মুখবন্ধ তিনি বলেছেন-

> “বাঙালি মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার না করিলে কখনোই ভাষার ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুষ্টি সাধন হইবে না।”[vi]

বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পরিভাষা না থাকার কারণে বিজ্ঞান চর্চায় সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ক্ষেত্রে পরিভাষাগত নানা কারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ,এই প্রসঙ্গে তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন -

> “এ বিষয়ে উক্ত মহাত্মাদ্বয়ই প্রথম পথপ্রদর্শক। সরল বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে ইহাদিগকে যে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।”[vii]

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ একটি মাইলস্টোনের কাজ করেছে। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর বিদগ্ধতার পরিচয় বহন করে এই গ্রন্থ। তবে তিনি মনে করেন বেশি করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বই প্রকাশিত হলে তবেই এই ভাষাগত সমস্যা দূর হবে –

> ‘‘আমরা সভা সমিতি করিয়া পরিভাষা বাঁধিয়া দিলেও কার্যত সেই পরিভাষা কিরূপফলদায়ক হইবে তাহা বলা দুরূহ। ওই সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিয়া পুস্তক লিখলে তবেই ওহার দোষগুণ ঠিক বুঝতে পারা যাইবে। বাংলা ভাষায় বহুল পরিমাণে বৈজ্ঞানিক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত না হইলে পরিভাষার দোষগুণ সাম্যকরূপে বিচার করা যাইতে পারে না’’[viii]

১৯০৪ সালে বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে তিনি বিদেশের নানা রাসায়নিক যন্ত্রাগার পরিদর্শনে যান। পরবর্তী সময় তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান গবেষণাকে ত্বরান্বিত করেছে, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। লন্ডনে ১৯১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে তিনি সর্বদা যুক্ত ছিলেন।

দেশের স্বনির্ভরতার জন্য শিল্পক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন আছে এই বিষয়টি তিনি অনুভব করেন, বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের স্থাপন এই ভাবনারই ফসল, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত হতে গেলে বিজ্ঞান চর্চা, উপযুক্ত গবেষণা ও সঠিক গবেষণাগার প্রয়োজন, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে সেই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতন বিষয়গুলি তখন মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছিল কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা চেতনা বিকাশ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আগে প্রয়োজন। ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার স্বাস্থ্য সচেতনতার মতো বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে জাতির সার্বিক অগ্রগতির জন্য। তাঁর মতে দেশকে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করতে হবে। ডিগ্রি কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে তিনি বরাবর ছিলেন উদাসীন। সমাজে যারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হবে তাদেরই সমাজকল্যাণমূলক কাজে অগ্রসর হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন -

> ‘‘গভর্রমেন্টের আশায় বসে থাকিলে কিছুই হইবে না। তাহারা ৩০ কোটি টাকা শুষিয়া লইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ৫০০০০ টাকা দেয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও ঐরূপ কিছু দিয়া বিদায় করে।’’[ix]

শিক্ষা জগতের সাথে সাথে বাস্তব পরিস্থিতিও ছিল তাঁর নখদর্পনে। প্রখর বিশ্লেষণ ক্ষমতা দ্বারা তিনি তৎকালীন পরিস্থিতির আসল রূপটি সম্বন্ধে নিজে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকেও এই বিষয়ে অব্যাহত করার চেষ্টা করেছেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে যেরকম পথপ্রদর্শকের কাজ করেছেন তেমনি শিল্প ক্ষেত্রে দেশীয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তিনি অন্যতম কারিগর। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে মানুষের মনে দেশীয় কলকারখানা স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়টি সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ছিল কিন্তু সেই শিল্প, কলকারখানা স্থাপনে বাস্তব রূপায়নের অভাব ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং কলকারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যার দ্বারা বাঙালি তথা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে স্বদেশী কলকারখানা স্থাপন ও স্বনির্ভরতার এক বাস্তবসম্মত উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কটের মাধ্যমে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের যে ঢেউ সে সময় উঠেছিল তাতে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করলে কেবল হবে না। তার সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, ওষুধপত্র বিদেশি কোম্পানির সাথে টক্কর দিয়ে সেই একই দামে স্বদেশে উৎপাদন করে বাজারে আনতে হবে। তবেই আন্দোলন সফল হওয়া সম্ভব ছিল, জাতির অগ্রগতি সম্ভব ছিল। কেবলমাত্র বিদেশি দ্রব্য বয়কট

করতে বললে মানুষের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হবে না এর সাথে সাথে সেই দ্রব্যাদি যোগান দেয়ার জন্য স্বদেশী কলকারখানা শিল্প স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবন তিনি করেছিলেন। প্রখর বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন মানব দরদী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বাঙ্গালির শিল্প কলকারখানা জগতে পথপ্রদর্শক রূপে ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রকৃত শিক্ষিত হতে গেলে শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকলে হবে না, দেশের ও সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হবে। জাতীয় প্রয়োজনে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করবে, - এই সাহস ও দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশপ্রেম, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে ঘটে চলা রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। ১৯০১ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর সাথে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচয় হয়। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রফুল্লচন্দ্র 'খদ্দর' প্রচারের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯১৯ সালে চিত্তরঞ্জন দাস রাওলাট আইনের প্রতিবাদস্বরূপ যে সভার আয়োজন করেছিলেন সেখানে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন -
'আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষণাই আমার কাজ, কিন্তু এমন সময় আসে যখন বৈজ্ঞানিককে ও দেশের আহবানে সাড়া দিতে হয়।'

ছাত্রদের সুস্থ সবল শরীর ও কর্মঠ হওয়ার বিষয়টিকেও তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে শিক্ষা কেবল ডিগ্রী অর্জন করা নয়, স্বাধীনতা কেবল এটি শাসক গোষ্ঠীর থেকে মুক্তি পাওয়া নয়, শিক্ষা দ্বারা ছাত্রদের এমন দৃঢ় মানসিকতা গড়ে উঠবে যার ফলে তারা সার্বিক অর্থে উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। বৌদ্ধিক বিকাশের সাথে সাথে আর্থিক স্বনির্ভরতার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব।

দীর্ঘ শিক্ষক-জীবন, ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞান চর্চায় পথিকৃৎ এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটি তাঁর কর্মব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকেও বারেবারে নানান সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে, ছাত্র সম্প্রদায়ের সক্রিয় উপস্থিতিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষর সময় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ত্রাণের কাজে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। সেই টাকা দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চলে উন্নতির জন্য ব্যবহার করা হয়। পূর্বে তিনি চরকা কাটার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না। খুলনার এই দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামের সাথে পরিচিত হওয়ার পর তিনি চরকা কাটার বিষয়টিকে সমর্থন করেন। চরকা দুর্ভিক্ষে বিদ্ধস্ত গ্রামের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য সাহায্য করবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে বন্যার কাজে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের নওগাঁ, পর্বতপুর, পাবনা, রাজশাহী অঞ্চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাহায্যর জন্য গঠিত কমিটির সভাপতি হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হন সাধারণ সম্পাদক। এই কমিটির সদস্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলরতন সরকার, আশুতোষ মুখার্জি, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সংস্থা সারা ভারত থেকে প্রায় দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। যুব সম্প্রদায়ের সহায়তায় বন্যা কবলিত অঞ্চলে ত্রাণের কাজে এই টাকা ব্যবহার করা হয়।

জাতির আদর্শ, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ও বিজ্ঞান সাধনার পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর শিক্ষাদর্শন শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে থেমে থাকেনি, তিনি সার্বিক অর্থেই শিক্ষাকে জীবন বিকাশের মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন ।

তথ্যসূত্র:

i. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী', চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড, কলকাতা: ১৯২৭,পৃ-২৫১।

ii. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার' , কলকাতা: পাতাবাহার, ?,পৃ-৩৪।

iii. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী'চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড ,কলকাতা: ১৯২৭,পৃ-২৫১।

iv. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, 'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার', কলকাতা : পাতাবাহার, ?,পৃ-২৬।

v. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, 'আত্মচরিত', কলকাতা :ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ?, পৃ - ৬৩।

vi. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় ,প্রবোধচন্দ্র , 'রাসায়নিক পরিভাষা', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩১৯ , পৃ- ৯০।

vii. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় ,প্রবোধচন্দ্র ,'রাসায়নিক পরিভাষা', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩১৯, পৃ- ৯০।

viii. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় ,প্রবোধচন্দ্র ,'রাসায়নিক পরিভাষা', কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির ,১৩১৯, পৃ- ৯০।

ix. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ,'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' ,চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড ,কলকাতা : ১৯২৭,পৃ-৫২।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

1. মাইতি, অচিন্ত্য কুমার, '*আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়*',কলকাতা : গ্রন্থতীর্থ, *২০০১।*
2. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, *'অধ্যায়ন ও সাধনা'*, বড়দা এজেন্সি, কলকাতা: ১৩৪০।
3. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, *'অন্ন সমস্যায় বাঙালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার'*, কলকাতা :পার্ক বুক ব্যুরো, ১৯৬১।
4. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, *'আত্মচরিত'*, কলকাতা :ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি,?
5. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় ,প্রবোধচন্দ্র , *'রাসায়নিক পরিভাষা'*, কলকাতা :বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির, ১৩১৯।
6. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, *'বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার*, কলকাতা :পাতাবাহার,?
7. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র , *'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী* ,চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড, কলকাতা: ১৯২৭।
8. রায়, প্রসন্ন কুমার, *'আচার্য্য বাণী প্রথম খণ্ড*, কলকাতা :বুক কর্পোরেশন, লিমিটেড, ১৩৫৩।
9. রায়, প্রসন্ন কুমার, *'আচার্য্য বাণী দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা :বুক কর্পোরেশন লিঃ, ১৩৫৩।
10. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র(সম্পা), *'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান',* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।

ইংরেজি গ্রন্থ :

1. Roy, Prafulla Chandra, *'Life and Experiences of a Bengali Chemist (vol-1)',* kolkata: The Asiatic Society, 1996.